দৈনিক ইত্তেফাক

APR-2-7-2000
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

চার মাসের অধিক সময় ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে আছে। চৌদ্দ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পদচারণায় মুখরিত নয়, বরং তাদের অনুপস্থিতিতে এক ধরনের নীরবতা ছেয়ে আছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পাচ্ছে না ভয়ে, জীবনের হুমকি আসছে, ট্রেনে বোমা হামলা গুলী করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাই চৌদ্দ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিজ নিজ ঘর-বাড়ীতে বসে আছে; অপেক্ষা করছে কবে খুলবে বিশ্ববিদ্যালয়, কবে ক্লাস শুরু হবে, পরীক্ষা হবে ইত্যাদি। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা শেষ করতে না পারার কারণে উপরের শ্রেণীতে উঠতে পাচ্ছে না, শিক্ষা জীবনের ইতি টানতে পাচ্ছে না, কর্মজীবনের মুখ দেখার প্রস্তুতি নিতে পাচ্ছে না। এক দুঃসহ যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে ছটফট করছে তারা। শত শত শিক্ষকেরও অবস্থা তাই, যদিও কিছু সংখ্যক শিক্ষক ভিন্ন চিন্তা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে রাখার সাথে যারা যুক্ত তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রাখছেন, মোবাইলে আলাপ করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন এবং পাচ্ছেন বলে অভিযোগ আছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বছর ছাত্র ভর্তির কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। ভর্তি ফরম লুট করা হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে জীবন যেন ঘরবন্দী হয়ে আছে। কোন বাস ও ট্রেন চলছে না। কালো মুখোসধারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল যানবাহনের কাঁচ ও জানালা ভেঙ্গে দিয়েছে। প্রতিনিয়ত হুমকি আসছে মেরে ফেলার, গুলী করার, লাশ ফেলার। একটি সশস্ত্রবাহিনীর কাজ হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে হুমকির মুখে রাখা, প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসের মুখে রাখার। পৃথিবীর আর কোন দেশে এমন অবিশ্বাস্য কান্ড হওয়ার একটিও নজির আছে বলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। অথচ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে এভাবেই জিম্মি করে রাখা হয়েছে। কারা করছে? এই প্রশ্নের উত্তর সকলেরই জানা, লুকোবার তাতে কিছু নেই। প্রকাশ্যেই তারা তা করছে, বলছে, তাদের বাহিনী ও সমর্থনপুষ্ট লোকজন তা করছে, একটি বিরাট নেটওয়াক এখানে তৈরী হয়েছে।

ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের দু'জন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে গত চার মাস যাবৎ বন্ধ করে রেখেছে, আগামী দিনগুলোতেও বন্ধ করে রাখার পরিকল্পনা করেছে। এক সময় ছাত্র হত্যার বিচারের দাবি তাদের মুখ্য থাকলেও এখন বোধ হয় বিষয়টি তাতে আর সীমাবদ্ধ নেই, এখন এর সাথে জাতীয় রাজনীতিতে জামায়াতের ভিন্ন হিসেব যুক্ত হয়েছে। কৌশল হিসেবে চার দলীয় জোটের সমর্থন ইত্যাদিকে ব্যবহার করা হচ্ছে মাত্র। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিরাজমান সমস্যা ও সংকটকে ছোট করে দেবার উপায় নেই, এর শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত, এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের একটি নীলনক্সা যা জাতীয় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা-ভাবনা থেকে রচিত হচ্ছে, পরিচালিত হচ্ছে। হয়তো বিএনপি বিষয়টিকে সেভাবে বুঝতে চাইছে না, চাইবে না, প্রয়োজনও অনুভব করবে না। বিএনপি এ মুহূর্তে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যে কোন অশুভ শক্তির যে কোন শর্ত নিঃশর্তে গিলে খাচ্ছে। কিন্তু যারা বিএনপিকে ব্যবহার করছে–তাদের পরিকল্পনা বিএনপি অতীতেও ভেবে দেখেনি, ভবিষ্যতেও দেখবে তা বোধ হয় ভাবা যায় না।

যা হোক, যে কথা বলছিলাম, কোন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ হবে, বিচার হবে–সেটি যে কোন সভ্য নাগরিক আশা করে, কামনাও করে। কিন্তু বিচার চাওয়া ও পাওয়ার পথতো বিচারালয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই ঘটতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনন্তকাল বন্ধ রেখে বিচার চাওয়া ও পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কী? প্রতিহিংসা ও জেদই শুধু এ প্রক্রিয়ায় দেখানো যেতে পারে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনের মতো বন্ধ রাখার পরও যে দু'জন ছাত্র সন্ত্রাসীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জীবন ফিরে আসার কোন উপায় নেই, বিচারও এভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়। আদালতের কাছে যাওয়া, আইনের আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত অন্য কোনভাবে বিচার চাওয়া, শাস্তি দাবি করা ও পাওয়া সম্ভব কিনা তা আমরা জানি না। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটছে অন্য কিছু। এই হত্যার সাথে যুক্ত করা হয়েছে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের অনেকের নাম এবং দাবি করা হচ্ছে এদের শাস্তি দিতেই হবে, ব্যবস্থা নিতেই হবে। কথা হচ্ছে এই দাবি বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেইতো করা যেতে পারে। বিশ্ব বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি–এই যুক্তি মানতে রাজি নয় ছাত্র শিবির। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হত্যা এটিই প্রথম নয়। বহু ছাত্র নিহত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। ছাত্র শিবিরের হাতেই তো মারা গেছে ফারুক, মুসা, বকুল, মুশফিক, আইয়ুব আলীসহ অনেক ছাত্রই। একটি হত্যাকান্ডেরও কী বিচার হয়েছে? একজনও কী সাজা পেয়েছে? ঐ সব হত্যাকান্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে, আবার পরিবেশ তৈরী করে খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে ইতোপূর্বে কোন ছাত্র সংগঠনই হত্যার প্রতিশোধ নিতে সড়কপথে বন্দুক হাতে বসে থাকেনি, বাসে গুলী করেনি, ট্রেনে গুলী ছোঁড়েনি, মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে রাখেনি। শিক্ষকদের জীবন বিপন্ন করার এতোসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করেনি। কিন্তু ছাত্র শিবিরই একমাত্র ছাত্র সংগঠন যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক সশস্ত্র পন্থায় শিক্ষাজীবন অচল করে রেখেছে, ছাত্র-শিক্ষকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এবার ছাত্র শিবির এবং জামাত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অচল করে রাখার জন্য বিএনপির রাজনৈতিক সমর্থন চেয়েছে, বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে হচ্ছে তা দিচ্ছেনও। চারদলীয় জোট দীর্ঘ সময় ধরে সিলেট ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে এটিকে চিহ্নিত করার কৌশল আঁটতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন তাতে ব্যাহত হল কিনা, তা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। জামাত বাহ্যিকভাবে শক্তির প্রয়োগে ছাত্র শিবিরের ক্যাডার বাহিনী ব্যবহার করলেও ছাত্রদলের নৈতিক সমর্থন তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এককভাবে ছাত্র শিবির দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতিপয় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল, তাই তারা বিএনপি এবং ছাত্র দলের সমর্থন আদায় করার কৌশল গ্রহণ করেছে। বিএনপির সমর্থন পেতে জামাতের কষ্ট হবার নয়, কিন্তু ছাত্র দলের পক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরকে নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়া বেশ কষ্টকর, ঝুঁকিপূর্ণও বটে। কেননা ছাত্র শিবিরের হাতেই নিহত হয়েছে ছাত্রদল নেতা মুসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকের মেধাবী ছেলে মুশফিক। ঐসব হত্যাকান্ডের বিচার হয়নি। এখনো প্রতি বছর ছাত্রদলের ছাত্র-ছাত্রীরা মুসা এবং মুশফিক হত্যার দিনগুলো বেশ আবেগ দিয়ে পালন করে থাকে। ছাত্র শিবিরের এই নির্যাতনের শিকার হয়েছে অনেকেই। ফলে ছাত্র দলের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে জামাত শিবিরের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করা মোটের উপর অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে কিছু অছাত্র নেতাকে দিয়ে তথাকথিত সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে রাখার যে আবরণ দেওয়া হয়েছে এর সাথে ছাত্রদলের অধিকাংশ কর্মী-সমর্থকের সমর্থন নেই। বিএনপি জামাতঘেঁষা রাজনীতির কারণেই ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত হতে পারেনি, শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারেনি। এখন বিএনপি নীতি তাদেরকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরো বেশী বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। ছাত্র মজলিস নামক ছাত্র সংগঠনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে রাখার জন্য যে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-এর নাম শোনা যাচ্ছে তা মূলতই ছাত্র শিবিরের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ব্যানার, এতে ছাত্রদলের সাথে যুক্ত শহরের কিছু অছাত্র নেতা যুক্ত আছে, ছাত্র মজলিসেরও কেউ কেউ থাকতে পারে–যাদের কোন ছাত্রত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। সম্প্রতি এই তথাকথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা চার দলীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে ঢাকায় এসেছিলেন। গোলাম আযম ছাড়া অপর তিনজনের সাথে ছাত্রদলের নেতারা সাক্ষাৎ করেছেন। বেগম জিয়া, হু. মু এরশাদ এবং আজিজুল হক তাদেরকে সাক্ষাৎ দিয়েছেন। সকলেই অভিন্ন সুরে সরকার পতনের আন্দোলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে নেতৃত্ব দিতে হবে বলে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা কেউই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে অবিলম্বে খুলে দেয়ার তেমন কোন আহ্বান জানাননি। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অচলাবস্থার জন্য সরকারকে দায়ী করেছেন। বেগম জিয়া সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি করেছেন। ক্ষমতায় থাকার সময় ছাত্রদল নেতা মুসা হত্যার আসামীদের গ্রেপ্তার করতে পারেননি। তাঁর সাথে যারা সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আইয়ুব হত্যার চার্জশিটভুক্ত আসামীও উপস্থিত ছিল। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করবে কে?

চট্টগ্রামের ছাত্র নেতাদের ঢাকায় চার দলীয় নেতাদের চার দলীয় ছাত্রদের নিয়ে গঠিত বলে দাবী করা হয়েছে, কার্যতঃ এতে রয়েছে শুধু ছাত্র দল ও ছাত্র শিবির সংগঠন, জাপার তেমন কোন ছাত্র সংগঠন নেই, ইসলামী ঐক্যজোটের ছাত্র মজলিসের পৃথক কোন কার্যক্রম চোখে পড়ে না। সুতরাং, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দখলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হলেও এতে মূলতঃই ছাত্র শিবির নেতৃত্ব দিচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জামায়াতের নীলনকশা বাস্তবায়ন করছে। ছাত্রদল উভয় ক্ষেত্রেই নামমাত্র রয়েছে। এর ফলে ছাত্রদলের ভাবমূর্তি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটি গঠন করে লাভবান হচ্ছে ছাত্র শিবির। আওয়ামী বিরোধী মানসিকতায় বেড়ে উঠছে ছাত্র-ছাত্রীরা। সরাসরি ছাত্র শিবিরকেই গ্রহণ করছে, ছাত্র দলকে নয়। তা ছাড়া ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অথবা ছাত্র ঐক্যের নাম ব্যবহার করে সিলেট ও চট্টগ্রামে ছাত্র শিবির স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে হরতাল ডাকা, জামায়াত-শিবিরের শক্তি ও প্রভাব প্রদর্শনও করতে পাচ্ছে। জামায়াত দেশব্যাপী এ ধরনের একটি ছাত্র ঐক্য গড়ে তোলার কথাটি তাদের রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ থেকেই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে বলে মনে হচ্ছে। এরই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থেকে চট্টগ্রামের ছাত্র নেতাদের ঢাকার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের জন্য পাঠিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে বিএনপির মনোভাব বোঝারও কোন পরিকল্পনা থাকতে পারে। দেশব্যাপী চার দলীয় কোন ছাত্রঐক্য গড়ে উঠেনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে সিটি করপোরেশন নির্বাচন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যেহেতু এক ধরনের সম্পর্ক ছাত্র সংগঠনের মধ্যে গড়ে উঠেছে, এই ধারাকে দেশব্যাপী গড়ে তোলার সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হতে পারে চট্টগ্রামের ছাত্রঐক্যের প্রতিনিধি দল বেগম জিয়ার সাথে সাক্ষাৎকালে ছাত্রঐক্যের আদর্শিক কিছু সমস্যার প্রকাশ ঘটেছে, ছাত্রদলের প্রতিনিধিরা নিজ দলের নেতৃবৃন্দের কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হতে পারেননি, ফলে পরদিন তারা গোলাম আযমের সাথে নির্ধারিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থাকেনি। মনে হচ্ছে ছাত্র শিবির বেগম জিয়ার সম্মুখে ছাত্রদলকে কোন না কোনভাবে হেয় করার ফন্দি এঁটেছিল– যা ছাত্র দলের প্রতিনিধি বুঝতে পেরেছিল। প্রতিক্রিয়া হিসেবে গোলাম আযমের সাথে সাক্ষাতে ছাত্র দলের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেনি, ফলে তা কার্যতঃ ছাত্র শিবির ও ছাত্র মজলিসের সাক্ষাতে পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রামের ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতে বেগম জিয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য শুধু সরকারকে দায়ী করেছেন, বর্তমান সরকারের পতনের জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যায়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য তাঁর মামুলি আহ্বানের বেশি কিছু শোনা যায়নি। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আরো দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার সাথে তার দল বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোন গভীর ক্ষোভ জড়িত নেই, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়েও কোন মাথাব্যথা আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। যারা ট্রেন ও বাসে গুলী করার হুমকি দেয়, যারা ট্রেনের ড্রাইভারদের অপহরণ করার সাজান নাটক উপস্থাপন করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়ার দাবি তিনি করেননি, তিনি শুধু সরকারকে দায়ী করে একে উৎখাতে ছাত্র নেতাদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন, ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন নিয়ে কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন না। একই কথাই বললেন, হু. মু. এরশাদ, গোলাম আযম, আজিজুল হক। এর মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে চারদলীয় নেতৃবৃন্দের অভিন্ন সুর প্রতিধ্বনিত হল, তারা এটিকে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের ইস্যু হিসেবে দেখতে, ব্যবহার করতে চান, জিম্মি করে রাখতে চান। এর পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে তা চার দলীয় নেতৃবৃন্দ বুঝতে চাইছে না। ভবিষ্যতে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জিম্মি করে রাখার উদাহরণ তৈরী হল। তবে জামায়াত-শিবির যে পরিকল্পনা থেকে চট্টগ্রামের ছাত্রসংগ্রাম প্রতিনিধিদের চার দলীয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের জন্য ঢাকায় এনেছিল সেই দেশব্যাপী ছাত্র সংগঠন পরিষদে ব্যানার তৈরী আপাতত সফল হয়নি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ঢাকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পরিকল্পনা, সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে তা ভাববার কোন কারণ নেই, বরং সে ধরনেরই ইঙ্গিত পাওয়া গেল চট্টগ্রামের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের আপাতত অসফল সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে।

কোন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ হবে, বিচার হবে–সেটি যে কোন সভ্য নাগরিক আশা করে, কামনাও করে। কিন্তু বিচার চাওয়া ও পাওয়ার পথতো বিচারালয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই ঘটতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনন্তকাল বন্ধ রেখে বিচার চাওয়া ও পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কী? প্রতিহিংসা ও জেদই শুধু এ প্রক্রিয়ায় দেখানো যেতে পারে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনের মতো বন্ধ রাখার পরও যে দু'জন ছাত্র সন্ত্রাসীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জীবন ফিরে আসার কোন উপায় নেই, বিচারও এভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়। আদালতের কাছে যাওয়া, আইনের আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত অন্য কোনভাবে বিচার চাওয়া, শাস্তি দাবি করা ও পাওয়া সম্ভব কিনা তা আমরা জানি না।